জলহীন ভবিষ্যৎ?

অপচয় না রুখলে অচিরেই কিন্তু শেষ হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর জলভাণ্ডার। জলহীন ভবিষ্যতই কি তাহলে প্রাপ্তি মানবজাতির? উত্তর খুঁজলেন ইন্দ্রাণী ঘোষ।

একবিংশ শতকের শুরুর দিকের এক সময়। বিশ্বায়ন আর পুঁজিবাদের হাত ধরে সুদূর সাগরপাড়ের পণ্য তখন আমাদের হাতের মুঠোয়। নিত্য-নতুন বিদেশি ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন জেঁকে বসছে মধ্যবিত্তের সদ্য নাগালের মধ্যে আসা টেলিভিশনের পরদায়। ঝাঁ-চকচকে শোরুম, নামী-দামি ব্র্যান্ডের হাতছানিতে মজতে শুরু করেছে আপামর ভারতবাসীর মনন। ঠিক এইসময়েই কাগজের পাতায় ভেসে উঠল অসম এক আন্দোলনের ছবি। আমেরিকান এক নরম পানীয়ের কোম্পানির কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধে’ নেমেছেন কেরলের পালাক্কাড় জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম প্লাচিমাডার মানুষজন। তাঁদের অভিযোগ, গ্রামে আমেরিকান ওই কোম্পানির কারখানা স্থাপনের পর থেকেই বিপজ্জনকভাবে কমতে শুরু করেছে গ্রামের জলস্তর। শুধু তাই নয়, টিউবওয়েলের হাতলে চাপ দিলে নাকি যে-জল উঠে আসছে, তাতে মিশে থাকছে কারখানা থেকে নির্গত দূষিত নানারকম পদার্থ, ধাতব বর্জ্য! প্রথমে নিতান্ত সাধারণভাবে কারখানার গেট বন্ধ করে আদিবাসীদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, অচিরেই তা বিশাল

দুঃখের বিষয়, সমগ্র বিশ্বেই জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, সেই হারে বিশুদ্ধ জলের জোগান বাড়ছে না। জনসংখ্যার চাহিদার সঙ্গে জলের জোগানের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কে ক্রমাগত কমছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর।

আকার ধারণ করল। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অধিকারের দাবির কাছে শেষমেশ মাথা নোয়াতে বাধ্য হল বহুজাতিক ওই সংস্থা।

বিশুদ্ধ ও পরিস্রুত পানীয় জলের মৌলিক অধিকার রক্ষার এ লড়াই বস্তুত জল-আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম মাইলফলক। প্লাচিমাডার এ ঘটনার পর বহুবছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু বিশুদ্ধ জলের মৌলিক অধিকার কি আজও পেয়েছে মানুষ? এ প্রশ্নের উত্তর মেলে সামান্য কিছু পরিসংখ্যানেই। ইউনিসেফ (ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেন'স ফান্ড)-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, সারা বিশ্বে প্রায় চারশো কোটি মানুষ (যা কিনা গোটা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ)-ই বছরের অন্তত একটা মাস জলসংকটে ভোগেন। এর মধ্যে প্রায় দু'শো কোটি মানুষ এমন দেশে থাকেন, যেখানে জলের মতো জীবনধারনের মৌলিক উপাদানটির যোগান সারাবছরই অপ্রতুল!

জল-সংঘাত

প্রসঙ্গত, জলের এই সংকট, বিশুদ্ধ জলের অপ্রতুলতা কিন্তু কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিও। ইউনিসেফ-এরই অপর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত যে-সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছে, তার মধ্যে ৭৪%-র মূলেই কোনও না কোনওভাবে রয়েছে জল। ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কখনও সমুদ্রের জল ঢুকে নষ্ট হয়ে গিয়েছে জমির উর্বরতা (২০০৯ সালে আয়লা ও ২০২০ সালে আমফানের পর সুন্দরবন এলাকার বহু একর জমি বানভাসি হয়ে চলে গিয়েছে সমুদ্রের নোনা জলের আওতায়)। দিনের পর দিন বৃষ্টির অভাবে কখনও কোনও দেশে মাটি শুকিয়ে ফুটিফাটা হয়েছে, কৃষকের কষ্টের ফসল খেতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, জলের অভাবে ঘোষিত হয়েছে খরা। আবার কোনও দেশ ভেসে গিয়েছে অতিবৃষ্টির দাপটে। বন্যায় ভিটেছাড়া হয়েছেন লক্ষ-লক্ষ মানুষ। যত দিন গিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এইধরনের ঘটনার প্রকোপ ক্রমাগত বাড়তে থেকেছে। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায় গতবছরের জার্মানির ভয়াবহ বন্যাকে কিংবা ২০১৯ সালে চেন্নাই ও মহারাষ্ট্রের মারঠওয়াড়া অঞ্চলে অনাবৃষ্টিজনিত খরাকে। জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ফলে বিশুদ্ধ জলের জন্য বেড়েছে মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে শুরু হয়েছে 'ওয়াটার কনফ্লিক্ট'—বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে সংঘাত। নদীর জলকে বশ মানাতে বাঁধ দিয়েও নিশ্চিন্ত হয়নি মানুষ। সেই নদীর জলের অধিকার নিয়ে বেঁধেছে কূটনৈতিক বিবাদ। ভারত-বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে চুক্তি থেকে শুরু করে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু ও তার শাখানদীসমূহের জলের অধিকার নিয়ে লড়াই, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের জলের দখল নিয়ে সিরিয়া-ইরাক-টার্কির বিবাদ কিংবা নীল নদের জলের দখল নিয়ে মিশর-ইথিয়োপিয়ার ঝামেলা... ওয়াটার কনফ্লিক্টের

উদাহরণ ছড়িয়ে সর্বত্র। এ তো গেল রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে জল-বিবাদের কথা, খোদ ভারতের মধ্যেই যে গোদাবরী-কৃষ্ণার জল নিয়ে কর্নাটক-অন্ধ্রপ্রদেশ, কিংবা কাবেরীর জলবণ্টন নিয়ে কেরল-কর্নাটক-তামিল নাড়ুর মধ্যেও যে ঝামেলা চলছে বহুদিন থেকে, সে কথা তো সর্বজনবিদিত।

'নট আ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক!'

কিন্তু মানুষের যাপনের অপরিহার্য উপাদান রূপে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাকে সমার্থক করে দেখা হয়েছে 'জীবন'-এর সঙ্গে, পৃথিবীর তিনভাগ অংশ জুড়ে যে স্থানাধিকার করে রয়েছে, সেই আপাত নিতান্ত, সামান্য জলের জন্য কেন এত হাহাকার বিশ্বজুড়ে? উত্তরটা খুবই সহজ।

পৃথিবীর মোট জলভাগের ৯৭%-ই কিন্তু সমুদ্রের জল, অর্থাৎ সে জল নোনা, খাওয়ার অযোগ্য। আর বাকি স্বাদুজলের তিন শতাংশের মধ্যে ২.৫%-ই জমাট বেঁধে রয়েছে হিমবাহ রূপে, কিংবা মেরুপ্রদেশে, অথবা এমন কোনও রূপে, যাকে কোনওভাবেই খাওয়ার যোগ্য হিসেবে 'ট্রিট' করা যাবে না। অর্থাৎ পেয় জল হিসেবে রইল পড়ে মোটে ০.৫%। আর এই ০.৫%-কে নিয়েই যত মারামারি, ঝামেলা! এই ০.৫% 'বিশুদ্ধ' জলেই চলছে খাওয়া থেকে শুরু করে ঘর-গেরস্থালির কাজ, কৃষিকাজ। এমনকি, কলকারখানাতেও ব্যবহৃত হচ্ছে 'ট্রিট' করা এই জল। তারপর নানারকম রাসায়নিক বর্জ্য মিশ্রিত সেই জল মিশছে নদীতে বা সমুদ্রে বা অন্য কোনও জলাশয়ে। এই জলেই অহরহ মিশছে মানুষ কিংবা পশুপাখি নিঃসৃত বর্জ্য। এই জলেই জমছে প্লাস্টিক। নানা রাসায়নিক, চাষের জমি থেকে আগত কীটনাশকের প্রভাবে জল দূষিত থেকে দূষিততর হচ্ছে।

এরই মধ্যে দ্রুতগতিতে বাড়ছে জনসংখ্যা। জনসংখ্যার অসম বণ্টনও কোনও না কোনওভাবে প্রভাব ফেলছে বিশ্বজোড়া এই জলের হাহাকারে। দুঃখের বিষয়, সমগ্র বিশ্বেই জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, সেই হারে কিন্তু বিশুদ্ধ জলের যোগান বাড়ছে না। জনসংখ্যার চাহিদার সঙ্গে জলের যোগানের এই ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কে ক্রমাগত কমছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর। ইউনাইটেড নেশনস-এর ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন-এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী, গত এক শতকে জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে, তার থেকেও দ্বিগুণ হারে বাড়ছে বিশুদ্ধ জলের চাহিদা। শিল্পবিপ্লবোত্তর বিশ্বায়নের যুগে জনবিস্ফোরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কলকারখানা, খাদ্যের যোগান দিতে বেড়েছে 'ওয়াটার ইনটেনসিভ' কৃষিকাজ। আর এতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রায় ৭০% বিশুদ্ধ পেয় জল!

শেষের সে দিন?

তবে বিপদের শেষ কিন্তু এতেই নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায়

রেখেই ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজ়েশন-এর সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে চমকে যাওয়ার মতো আরও এক তথ্য। ২০৩৫ সালে জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের জোগান বাড়াতে হবে আরও অন্তত ৭০%। আর এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে যে কী পরিমাণ জল প্রয়োজন হবে কৃষিকাজে, বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে, সে সহজেই অনুমেয়!

বিশ্বজোড়া জলের এই হাহাকারের আঁচ লাগতে শুরু করেছে আমাদের দেশেও। নীতি আয়োগের 'কম্পোজ়িট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনডেক্স' অনুযায়ী, ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যে ইতিমধ্যেই জলের অভাব বেশি করে অনুভূত হতে শুরু করেছে। এর মধ্যে নানা রাজ্যে ২১টি শহরে খুব তাড়াতাড়িই ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার প্রায় শেষের মুখে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্র, গুজরাত, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকা ২০১৮ সাল থেকেই জলের সমস্যায় ভুগছে। পরিস্থিতি যদি একইভাবে চলতে থাকে, তাহলে মাত্র ২০ বছরের মধ্যেই ভারতের ৬০% ভূগর্ভস্থ জলই হয় শেষ হয়ে যাবে, নয়তো শেষের পথে থাকবে। এছাড়া শুধুমাত্র জলের অভাবেই দেশের জিডিপি ছ'শতাংশ হ্রাস পেতে পারে!

বেঁচে থাকার চাবিকাঠি

আশার কথা, জল নিয়ে এত হাহাকারের মধ্যেও সারা বিশ্বেই সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানা দেশে সরকারের তরফ থেকে তো বটেই, বেসরকারি কিছু এনজিও-র উদ্যোগেও জল সংরক্ষণ ও জলের অপচয় নিয়ে নানাধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। এজন্য প্রথমেই জল কীভাবে খরচা করা হবে, তার জন্য নির্দিষ্ট একটি রূপরেখা বানিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। সরকারি তরফে রাষ্ট্র কীভাবে কোন খাতে কত জল খরচ করবে, কোন পথে তার 'জল-নীতি' ধার্য হবে, ইত্যাদি থাকবে সেই রূপরেখায়।

তবে সরকারি বা বেসরকারি তরফে নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও যতদিন না আমরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে সচেতন হব, ততদিন বিশুদ্ধ পেয় জলের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য হাহাকার চলতেই থাকবে। রাজস্থান, মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকার মানুষজন একবালতি পানীয় জলের জন্য মাইলের পর মাইল হাঁটবেন, আর আমরা এয়ারকন্ডিশনড ঘরে বসে টিভি দেখতে-দেখতে জল নিয়ে কৃত্রিম হাহাকার করতে-করতে দিনে-রাতে একগাদা জল খরচা করে শাওয়ারে স্নান করব! কল খুলে রেখে বন্ধ করতে ভুলে যাব কিংবা 'এমনি-এমনিই' একবালতি জল ফেলে দেব! তাই জলের ব্যাপারে যে-সচেতনতা, তা একেবারে ব্যক্তিগত স্তর থেকেই শুরু হওয়া দরকার। রেনওয়াটার হারভেস্টিংয়ের ব্যবস্থা না করতে পারেন, সম্ভব হলে গামলা বা বালতিতে বৃষ্টির জল অন্তত ধরে রাখুন। সেই জল দিয়েই ঘরের কাজ সেরে ফেলুন। এসির জল বালতিতে জমিয়ে রেখে সেই জলে ঘর মুছে নিন। যখন লাগবে না, তখন কল বন্ধ করে দিন। এতে একটু হলেও যদি জল বাঁচে, তাহলেও কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট লাভ।

কৃষিকাজ ও অন্যান্য কারখানায় কীভাবে, কতটা জল খরচ হবে, সে বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে নির্দিষ্ট রূপরেখার পাশাপাশি কারখানা ও কৃষক, উভয় তরফেই জল বাঁচানোর জন্য পরিকল্পনা করে নেওয়া প্রয়োজন। তাহলেই সেচের সময় বাড়তি জল খরচ থেকে বেঁচে যাবে। অনেকেই জানেন না, মাত্র একটা কাগজ উৎপাদনেই কিন্তু প্রায় ১০০ লিটার জল খরচ হয়ে যায়। আর কফি বিন প্রসেস করে মোটে এক কাপ কফি তৈরি করতে ১৫০ লিটার জল লাগে! ফলে এই বিপুল জলের খরচ সম্পর্কে সচেতন হন। তাছাড়া গাছ কেটে ফেলাও কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ফলে ক্রমাগত গাছ পুঁতে যাওয়াও খুব দরকার।

মনে রাখবেন, সমগ্র বিশ্বে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনই বিশুদ্ধ পানীয় জল পান না। হয়তো বা একবালতি জলের জন্য প্রতিদিন তাঁদের হাঁটতে হয় দশ কিংবা পনেরো কিলোমিটার! ফলে আপনার সামান্য সচেতনতাতেই হয়তো তাঁদের মুখে উঠতে পারে সহজলভ্য বিশুদ্ধ জল, থেমে যেতে পারে জল নিয়ে এত লড়াই, চিন্তা। আগামী পৃথিবীতে জলের অধিকার নিশ্চিত হোক সকলের, বিনামূল্যে সকলের কাছে পৌঁছে যাক পরিশুদ্ধ জল—এই স্বপ্ন তো দেখাই যায়!

ছবি: আইস্টক

তাঁর চ্যারিটেবল ট্রাস্ট নির্মিত চেক-ড্যামের সামনে অমলা রুইয়া
ছবি সৌজন্য: অমলা রুইয়া

জল মানুষের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমানে নানারকম রাসায়নিকের সাহায্যে জলকে বিশুদ্ধ করা হয়। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানতেন কীভাবে রেনওয়াটার হারভেস্টিং পদ্ধতিতে জলকে প্রাকৃতিক উপায়ে পরিশুদ্ধ করা যায়। আসলে রাসায়নিক যোগ করে জলকে শুদ্ধ করে তোলার অর্থই হল এর মধ্যে বাড়তি পলিউট্যান্ট যোগ করা! আমাদের দেশে জলের সমস্যা বেশি করে দেখা যায় রাজস্থানের থর মরুভূমি অঞ্চলে। আমাদের ট্রাস্ট রেনওয়াটার হারভেস্টিং পদ্ধতিতে সেখানে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করছে। এইসমস্ত এলাকায় ছাদে যে বৃষ্টির জল জমে, সেই জল সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে। এছাড়া দেশের নানা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আমরা প্রায় ৫৩০টি চেক-ড্যাম বা 'খাদিন' তৈরি করেছি। এই চেক-ড্যামগুলিতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে রাখা যায়। এই ড্যামে সংরক্ষণ করে রাখা জলের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার কূপগুলিতে সারাবছর জলের জোগান থাকে। ফলে এলাকায় যদি বর্ষায় কম বৃষ্টির কারণে খরিফ শস্য নষ্টও হয়ে যায়, তাহলেও কৃষকেরা এই ড্যামে সংরক্ষিত জল ব্যবহার করে রবি শস্য উৎপাদন করতে পারেন এবং তাঁর ক্ষতি পুষিয়ে যায়। শহরাঞ্চলে মাটিতে জল শোষণের জন্য 'পারকোলেশন পিপ' তৈরি করা যেতে পারে। এটি 'ফ্ল্যাশ ফ্লাড'-এর আশঙ্কা কমায় এবং ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার বৃদ্ধি করবে। আজকাল শহরাঞ্চলে রুফ ওয়াটার হারভেস্টিং পদ্ধতিতেও বাড়তি জল সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে। গাছ কেটে ফেলাও ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ফলে গাছ পোঁতা খুবই দরকার। এছাড়াও আজকের পৃথিবীর বেশিরভাগ জলের সমস্যাই মনুষ্যসৃষ্ট। ফলে আমাদেরই জলের অপচয় বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

অমলা রুইয়া, ওয়াটার অ্যাক্টিভিস্ট